

গঙ্গামায়ীর বিছানা ঘরের এদিকে হবে, আমার বিছানা ওদিকে হবে। সব ঠিক-ঠাক। হৃদে তখন বললে, তোমার এত পেটের অসুখ—কে দেখবে? গঙ্গামায়ী বললে, কেন, আমি দেখব, আমি সেবা করব। হৃদে একহাত ধরে টানে আর গঙ্গামায়ী একহাত ধরে টানে—এমন সময় মাকে মনে পড়ল!—মা সেই একলা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ির নবতে। আর থাকা হলো না। তখন বললাম, না, আমায় যেতে হবে!

“বৃন্দাবনের বেশ ভাবটি। নতুন যাত্রী গেলে ব্রজ বালকেরা বলতে থাকে, ‘হরি বোলো, গাঁঠরী খোলো!’”

বেলা এগারটার পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মা-কালীর প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। মধ্যাহ্নে একটু বিশ্রাম করিয়া বৈকালে আবার ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্তায় কাটাইতেছেন—কেবল মধ্যে মধ্যে এক-একবার প্রণবধনি বা “হা চৈতন্য” এই নাম উচ্চারণ করিতেছেন।

ঠাকুরবাড়িতে সন্ধ্যার আরতি হইল। আজ বিজয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ কালীঘরে আসিয়াছেন, মাকে প্রণামের পর ভক্তেরা তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। রামলাল মা-কালীর আরতি করিয়াছেন। ঠাকুর রামলালকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “ও রামনেলো! কই রে!”

মা-কালীর কাছে সিদ্ধি নিবেদন করা হইয়াছে। ঠাকুর সেই প্রসাদ স্পর্শ করিবেন—সেইজন্য রামলালকে ডাকিতেছেন। আর আর ভক্তদের সকলকে একটু একটু দিতে বলিতেছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে বলরামাদি সঙ্গে—বলরামকে শিক্ষা

[লক্ষণ—সত্যকথা—সর্বধর্মসমম্বয়—“কামিনী-কাঞ্চনই মায়া”]

মঙ্গলবার অপরাহ্নে ২৪শে অক্টোবর (৮ই কার্তিক, ১২৮৯, শুক্লা ত্রয়োদশী)। বেলা ৩টা-৪টা হইবে। ঠাকুর খাবারের তাকের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। বলরাম ও মাস্টার কলিকাতা হইতে একগাড়িতে আসিয়াছেন ও প্রণাম করিতেছেন। প্রণাম করিয়া বসিলে ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, তাকের উপরে খাবার নিতে গিছিলাম, খাবারে হাত দিয়েছি, এমন সময় টিকটিকি পড়েছে, আর অমনি ছেড়ে দিইছি। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ গো, ও-সব মানতে হয়। এই দেখ না রাখালের অসুখ, আমারও হাত-পা কামড়াচ্ছে। হলো কি জানো? আমি সকালে বিছানা থেকে উঠবার সময় রাখাল আসছে মনে করে অমুকের মুখ দেখে ফেলেছি! (সকলের হাস্য) হাঁ গো, লক্ষণ দেখতে হয়। সেদিন নরেন্দ্র এক কানা ছেলে এনেছিল, তার বন্ধু, চক্ষুটা সব কানা নয়; যা হোক, আমি ভাবলুম এ-আবার কি ঘটালে!

“আর একজন আসে, আমি তার জিনিস খেতে পারি না। সে আফিসে কর্ম করে, তার ২০ টাকা মাহিনা। আর ২০ টাকা কি মিথ্যা (bill) লিখিয়ে পায়। মিথ্যাকথা কয় বলে সে এলে বড় কথা কই না। হয়তো দু-চারদিন আফিসে গেল না, এইখানে পড়ে রইল। কি জানো, মতলব যে, যদি কারকে বলে কয়ে দেয় তাহলে অন্য জায়গায় কর্ম কাজ হয়।”

বলরামের বংশ পরম বৈষ্ণববংশ। বলরামের পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন—পরম বৈষ্ণব। মাথায় শিখা, গলায় তুলসীর মালা, আর হস্তে সর্বদাই হরিনামের মালা, জপ করিতেছেন। ইহাদের উড়িয়ায় অনেক জমিদারি আছে। আর কোঠারে, শ্রীবৃন্দাবনে ও অন্যান্য অনেক স্থানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবা আছে ও অতিথিশালা আছে। বলরাম নূতন আসিতেছেন, ঠাকুর গল্পছলে তাঁহাকে নানা উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সেদিন অমুক এসেছিল; শুনেছি নাকি ওই কালো মাগটার গোলাম!—ঈশ্বরকে কেন দর্শন হয় না?—কামিনী-কাঞ্চন মাঝে আড়াল হয়ে রয়েছে বলে। আর তোমার সম্মুখে কি করে সেদিন ও-কথাটা বললে যে, আমার

বাবার কাছে একজন পরমহংস এসেছিলেন, বাবা তাঁকে কুঁকড়ো রেঁধে খাওয়ালেন! (বলরামের হাস্য) “আমার অবস্থা” এখন মাছের ঝোল মার প্রসাদ হলে একটু খেতে পারি। মার প্রসাদ মাংস এখন পারি না,—তবে আঙুলে করে একটু চাখি, পাছে মা রাগ করেন। (সকলের হাস্য)

[পূর্বকথা—বর্ধমানপথে—দেশযাত্রা—নকুড় আচার্যের গান—শ্রবণ]

“আচ্ছা আমার একি অবস্থা বল দেখি। ও-দেশে যাচ্ছি বর্ধমান থেকে নেমে, আমি গরুর গাড়িতে বসে—এমন সময় ঝড়বৃষ্টি। আবার গাড়ির সঙ্গে কোথেকে লোক এসে জুটল। আমার সঙ্গে লোকেরা বললে, এরা ডাকাত!—আমি তখন ঈশ্বরের নাম করতে লাগলাম। কিন্তু কখনও রাম রাম বলছি, কখনও কালী কালী, কখনও হনুমান হনুমান—সবরকমই বলছি, এ কিরকম বল দেখি।”

ঠাকুর এই কথা কি বলিতেছেন যে, এক ঈশ্বর তাঁর অসংখ্য নাম, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা সম্প্রদায়ের লোক মিথ্যা বিবাদ করিয়া মরে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের প্রতি)—কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। ওর ভিতর অনেকদিন থাকলে ঝঁশ চলে যায়—মনে হয় বেশ আছে। মেথর গুয়ের ভাঁড় বয়—বইতে বইতে আর ঘেন্না থাকে না। ঈশ্বরের নামগুণকীর্তন করা অভ্যাস করলেই ক্রমে ভক্তি হয়।

(মাস্টারের প্রতি)—“ওতে লজ্জা করতে নাই। ‘লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়।’

“ও-দেশে বেশ কীর্তন গান হয়—খোল নিয়ে কীর্তন। নকুড় আচার্যের গান চমৎকার! তোমাদের বৃন্দাবনে সেবা আছে?”

বলরাম—আজ্ঞে হাঁ। একটি কুঞ্জ আছে—শ্যামসুন্দরের সেবা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি বৃন্দাবনে গেছলাম। নিধুবন বেশ স্থানটি।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নৌকাবিহার, আনন্দ ও কথোপকথন প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—‘সমাধিমন্দিরে’

আজ কোজাগর লক্ষ্মীপূজা। শুক্রবার ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। বিজয় (গোস্বামী) ও হরলালের সহিত কথাবার্তা কহিতেছেন। একজন আসিয়া বলিলেন, কেশব সেন জাহাজে করিয়া ঘাটে উপস্থিত। কেশবের শিষ্যেরা প্রণাম করিয়া বলিলেন, “মহাশয়, জাহাজ এসেছে, আপনাকে যেতে হবে, চলুন একটু বেড়িয়ে আসবেন; কেশববাবু জাহাজে আছেন, আমাদের পাঠালেন।”

বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর নৌকা করিয়া জাহাজে উঠিতেছেন। সঙ্গে বিজয়। নৌকায় উঠিয়াই বাহশূন্য! সমাধিস্থ!

মাস্টার জাহাজে দাঁড়াইয়া এই সমাধি-চিত্র দেখিতেছেন! তিনি বেলা তিনটার সময় কেশবের জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। বড় সাধ, দেখিবেন ঠাকুর ও কেশবের মিলন ও তাঁহাদের আনন্দ, শুনিবেন তাঁহাদের কথাবার্তা। কেশব তাঁহার সাধুচরিত্রে ও বক্তৃতাবলে মাস্টারের ন্যায় অনেক বঙ্গীয় যুবকের মন হরণ করিয়াছেন। অনেকেই তাঁহাকে পরম আত্মীয়বোধে হৃদয়ের ভালবাসা দিয়াছেন। কেশব ইংরেজী পড়া লোক, ইংরেজী দর্শন সাহিত্য পড়িয়াছেন। তিনি আবার